আল্লাহর পথে সংগ্রাম

মুহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন

প্রকাশক
আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, (৩য় তলা)
ঢাকা- ১০০০। ফোন : ৯৫৫৭১৩১
www.iscabd.org

প্রথম প্রকাশ : জুলাই- ২০০৪ইং
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি- ২০১০ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
আই.এস.সি.এ কম্পিউটার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা) ঢাকা- ১০০০।

নির্ধারিত মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আল্লাহর ঘর মসজিদ রক্ষার আন্দোলনে ঘাতকচক্রের বুলেটের আঘাতে যারা জীবন বিলিয়ে দিলেন, সেই প্রিয় সাথী– শহীদ হাফেজ আবুল বাশার, শহীদ রেজাউল করীম ঢালী, শহীদ হাফেজ ইয়াহইয়া ও শহীদ জয়নাল আবেদীনের জান্নাতী রূহের প্রতি উৎসর্গীত।

লিখকের কথা

সময়ের প্রয়োজনে কলম ধরেছি। সহযোদ্ধা বন্ধুদের অনুরোধে লিখতে বাধ্য হয়েছি। বিষয়টির ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য ফুটিয়ে তোলা এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য নয়; ইসলামী আন্দোলনের বন্ধুদের মাঝে মৌলিক ধারণা উপস্থাপনের স্বার্থেই এ লেখনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

গ্রন্থটি মূলত একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার রচনা সংকলন। বইটিতে জিহাদ কী, কেন ও কীভাবে- এ বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় আলোচনা তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহর পথে আমরণ সংগ্রামে নিজ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ শেষ হওয়ার পর সময়ের প্রয়োজনে, সর্বস্তরের মুক্তিকামী ছাত্র সমাজের দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আগামী দিনে এ গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধকরণে সকলের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। ইসলামী আন্দোলনের বন্ধুদের চলার পথে এ গ্রন্থটি সামান্য উপকারে আসলেও এ লেখনী স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দীনের রাহে কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন

সূচিপত্র

জিহাদ কী?	৪
জিহাদের তাৎপর্য	৫
জিহাদের প্রকৃতি	৬
কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ	৬
জিহাদের স্তর বা পর্যায়	৮
জিহাদের মাধ্যম বা উপকরণ	৯
জিহাদের শর্ত	১০
জিহাদের প্রকারভেদ	১১
জিহাদের পরিধি	১৩
প্রচলিত যুদ্ধ ও জিহাদের পার্থক্য	১৪
জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর বৈশিষ্ট্য	১৬
জিহাদ কেন?	১৭
জিহাদের ফজিলত	১৮
জিহাদ সর্বোচ্চ ইবাদত	১৯
জিহাদ ফরজ আমল	২০
জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিণাম	২০
শাহাদত সর্বোত্তম নিয়ামত	২১
জিহাদ কীভাবে?	২২
আল্লাহর পথে সংগ্রামের ধারাবাহিকতা	২৩
সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতি	৩১

জিহাদ বলতে শুধু কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামকে বুঝায় না। জিহাদের অর্থ ব্যাপক। কিতাল এর একটি পর্যায়মাত্র। কিতাল একটি বিশেষ অর্থপ্রকাশক শব্দ। কিতাল বা মুকাতালা অর্থ– পারস্পরিক যুদ্ধ করা এবং হত্যা করার চেষ্টা করা। আর জিহাদ অর্থ– লক্ষ্য অর্জনে অথবা উদ্দেশ্য সাধনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর মতে– জিহাদ অর্থ লক্ষ্য অর্জনে অথবা উদ্দেশ্য সাধনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। জিহাদ শব্দের এ অর্থগত ব্যাপকতার কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জিহাদ শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

অর্থ : (হে নবী!) আপনি কাফিরদের আনুগত্য-অধীনতা মেনে নিবেন না; বরং এ কিতাব আল-কুরআন দিয়েই ওদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের জিহাদ চালিয়ে যান। (সূরা ফুরকান, আয়াত : ৫২)

আলোচ্য আয়াতে জিহাদ বলতে পবিত্র কুরআনের অকাট্য যুক্তি ও দালীলিক শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে। এ জিহাদের দাবি হলো– তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতের পক্ষে দাওয়াত ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন। কিন্তু মাদানী সূরার অবতীর্ণ আয়াতসমূহে কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি ও নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদের রূপ ও ধারণা সম্পূর্ণই ভিন্ন রকম।

অতএব, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং তাঁরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল কর্মসূচির সমন্বয়ে রচিত পথের নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

জিহাদ কী (What is Jihad?)

আভিধানিক অর্থ : জিহাদ শব্দের মূল বা ধাতুগত উৎপত্তি জাহ্‌দুন ও জুহ্‌দুন শব্দ থেকে। এর অর্থ সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, সাধ্যের শেষসীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, কঠিন শ্রম ও শক্তি ব্যয় করা, কঠোর সাধনা ও কষ্ট স্বীকারে নিজেকে প্রস্তুত করা।

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরীয়তের পারিভাষিক সংজ্ঞায় জিহাদ বলতে বুঝায়– আল্লাহর কালিমার বিজয় ও প্রতিষ্ঠা সাধনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা, কষ্ট-ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করা।

জিহাদের লক্ষ্য : প্রচলিত মতবাদী সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার অবসান এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাই হলো জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। হুকুমতে এলাহী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এর সংরক্ষণ, সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্যও জিহাদ পরিচালিত হয়। অতএব ইসলামী হুকুমতের সংরক্ষণও জিহাদের লক্ষ্য। তবে এটা পরবর্তী পর্যায়।

বর্তমান অবস্থাতে অর্থাৎ যে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দীন (ইসলাম) পরাজিত এবং বাতিল (মতবাদী ব্যবস্থা) বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে প্রধানত দুটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে জিহাদ পরিচালিত হবে। যথা– ১. প্রতিষ্ঠিত মতবাদী সাংবিধানিক ব্যবস্থার অবসান।

২. ইসলামী হুকুমত তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Allah) প্রতিষ্ঠা।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

অর্থাৎ : তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম কর, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৩)

জিহাদের দাবি বা তাৎপর্য (Significance of Jihad)

সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই জিহাদের দাবি। ফিতনা সৃষ্টি নয়; বরং ফিতনা-ফাসাদের চির অবসানের লক্ষ্যেই জিহাদের হুকুম। সমাজের সকল অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করে শান্তিময় সমাজকাঠামো বিনির্মাণ এবং নতুন নির্মিত সমাজকাঠামো সংরক্ষণ করাই জিহাদের দাবি। জিহাদের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে– মানুষ দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জানবে, চিনবে কুফর ও জাহিলিয়াতকে এবং দীনে হককে কুফর ও জাহিলিয়াতের ওপর বিজয়ী করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কেননা একমাত্র দীনে হক (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

জিহাদ ও যুদ্ধ এক জিনিস নয়। তাই জিহাদের দাবিকে প্রচলিত যুদ্ধের ভয়ংকর ও বিভৎস অবস্থার সাথে তুলনা করা বা কল্পনা করা নিতান্তই বোকামী। কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদকে বাহ্যিকভাবে যুদ্ধের মতো মনে হলেও এর দাবি প্রচলিত যুদ্ধের সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামী জীবনাদর্শ সর্বদা ও সর্বত্রই ভারসাম্যপূর্ণ। জোর-জবরদস্তি করে কারও ওপরে আদর্শকে চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। এক্ষেত্রেও ইসলামী জীবনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ আমল জিহাদকে প্রচলিত যুদ্ধের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তুলনা করা আদৌ সমীচীন নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থ : দীন ইসলামে কোনো জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

ইসলামী জীবনাদর্শ এ ধরায় শান্তির আবাসন বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। আর এজন্য জিহাদের আমল। সমাজে সৃষ্ট জুলুম, অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও বন্দীত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গতে জিহাদের তরবারি গর্জে ওঠে মানবতার স্বার্থে। জিহাদের তরবারি হাতে নেওয়ার পূর্বে মুজাহিদকে হতে হয় ডাক্তার। আর ডাক্তার যদি রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করে তাতে দোষের ক আছে?

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা : মুসলমানরা চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় শত্রুর মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সা. সেনাপতির বেশে জিহাদ পরিচালনা করছেন। ঘোষণা করলেন– কে আছো এমন, যে আমার তরবারির যথোপযুক্ত ব্যবহার করবে? জনৈক সাহাবী বলে উঠলেন : আমি প্রস্তুত। হুজুর সা.এর মুবারক তরবারি নিয়ে সাহাবী অগ্রসর হলেন হুজুরের ইশারাকে লক্ষ্য করে। রাসূল সা. ডাকলেন, দাঁড়াও। বললেন– আমার তরবারি যেন অপাত্রে (শরীয়ত নির্দেশিত হুকুমের বাইরে) ব্যবহৃত না হয়। সাহাবী বীরবিক্রমে রওয়ানা হলেন যুদ্ধের ময়দানে। যেদিকে রাসূল সা.এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা রা. শহীদ হয়েছেন, সেদিকে দূর থেকেই লক্ষ্য করলেন, কে যেন হামযার কলিজা ছিঁড়ে চর্বণ করছে। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত সাহাবী রাসূলের দেওয়া নাঙ্গা তরবারি হাতে আঘাত হানার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলেন। লক্ষ্য করলেন, এক মহিলা হযরত হামযার কলিজা চর্বণ করছে। নাঙ্গা তরবারি শত্রুর গায়ে আঘাত হানতে পারল না। জিহাদের এ তরবারিতো একজন মহিলার শিরোচ্ছেদে ব্যবহৃত হতে পারে না।

প্রশ্ন হলো– কোন শক্তি যুদ্ধের ময়দানে এ নৈতিকতাকে স্মরণ করাতে পারে? এজন্যই ইসলামের জিহাদকে প্রচলিত প্রতিশোধপরায়ণ যুদ্ধের সাথে তুলনা করা যায় না। জিহাদের দাবি এর চেয়েও অনেক বড়। জিহাদের তাৎপর্য প্রচলিত যুদ্ধের তুলনায় অধিকতর মহৎ।

জিহাদের প্রকৃতি (Nature of Jihad)

জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক একটি কুরআনিক পরিভাষা। জিহাদ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি, বাকশক্তি, অর্থশক্তি, লেখনীশক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগসহ অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করাও বুঝায়। ইসলামী শরীয়তের আলোকে জিহাদ বলতে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, নফস ও শয়তান সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বুঝায়।
জিহাদের প্রকৃতি বর্ণনা করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَاهِدُوْ فِىْ اللّٰهِ حَقَّ جِهٰدِهٖ

অর্থ : জিহাদ করো আল্লাহর জন্য। যেমনিভাবে জিহাদ করা উচিত। (সূরা হজ্ব, আয়াত : ৭৮)
উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতবী রহ. লেখেন : তোমরা জিহাদ করো তোমাদের নফসের বিরুদ্ধে। তাকে আল্লাহর অনুগত বানানোর এবং লালসা, কামনা, বাসনা থেকে বিরত রাখার জন্য। শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তার প্ররোচনা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো জুলুম বন্ধ করার জন্য এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তাদের কুফরীকার্য প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে।
ইমাম কুরতুবীর মতে উপর্যুক্ত আয়াতে জিহাদ দ্বারা আল্লাহর যাবতীয় আদেশ পালন এবং সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ? (অমধরহংঃ ডযড়স ঔরযধফ রং?)
দু' ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম এসেছে। যথা–
১. অপ্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ
২. প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ
১. অপ্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ : অপ্রকাশ্য শত্রু বলতে নফস ও শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদকে প্রাথমিক পর্যায়ের জিহাদ বা মানসিক যুদ্ধ বলা যেতে পারে। নফসের চাহিদা হলো মন্দ, পাপ,

অন্যায় কাজের দিকে ঝুঁকে পড়া। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ সংঘটিত হয় নফসের প্ররোচনায়।
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

অর্থাৎ : নিশ্চয়ই নফস (নফসে আম্মারা) অন্যায় কাজের আদেশ করে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৩)
হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَى) اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهٖ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ

অর্থ : যে লোক স্বীয় নফসকে আল্লাহর অনুগত বানাবার লক্ষ্যে জিহাদ করল, সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ। (মুসনাদে আহমাদ)
শয়তান হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের অপ্রকাশ্য শত্রু। নফসের প্ররোচনা দেওয়াই তার সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। তাই এ চিরশত্রুর হাত থেকে বাঁচার তাগিদ সার্বক্ষণিক থাকা জরুরী। শয়তান দুদিক দিয়ে তার শত্রুতা অব্যাহত রাখে। প্রথমত নফসের ওপর প্রাধান্য বিস্তার, দ্বিতীয়ত পরিবেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার।
অতএব, নিজের অন্তর থেকে যেমন শয়তানের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, সাথে সাথে বাইরের পরিবেশ থেকেও শয়তানের কর্তৃত্বকে নির্মূল করতে হবে। নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদ প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজ।
কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُو ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

অর্থ : তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)
২. প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ : প্রকাশ্য শত্রু বলতে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও জালিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে আলাদা আলাদা নির্দেশনা এসেছে এবং সাথে সাথে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে। কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاۤ يُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

অর্থ : আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা ও নির্মমতা প্রকাশ করুন। (সূরা তাওবা, আয়াত : ১০)
মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম এসেছে এভাবে–

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

অর্থ : তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেভাবে তারা সকলে মিলে
তোমাদের সাথে লড়াই করছে।
জালিম, তাগুত ও খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের হুকুম দিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থ : তোমাদের কী হলো? কেন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছো না, ঐসব নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে; যারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে এই বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ড থেকে মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)
দেশ ও বিশ্বব্যাপী জুলুমের অবসানকল্পে যথাযথ শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আল্লাহ হুকুম করেছেন মুমিন জনগোষ্ঠী ও ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থ : তোমরা শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করো, তোমাদের পালিত ঘোড়া (সময়োপযোগী উপকরণ) থেকে, যাতে আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০)
উপর্যুক্ত আয়াত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণের ইঙ্গিত করছে। প্রস্তুতি গ্রহণের অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন নাও হতে পারে। অতএব, জিহাদের ব্যাপকতা নিঃসন্দেহে সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সময়োপযোগী যথার্থ প্রস্তুতি শর্ত। এছাড়া সময় এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রস্তুতির ধরণও ভিন্নরকম হতে পারে। উল্লেখ্য যে, সশস্ত্র জিহাদের

নামে শরীয়তের আহকাম পরিপন্থি ও অদূরদর্শী কোনো কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়।

জিহাদের স্তর বা পর্যায় (Stages of Jihad)

হাদীস শরীফে অন্যায়ের মূলোৎপাটন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের তিনটি স্তর বা পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ رَءَا مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, সে যেন বাহুশক্তি দ্বারা তা বদলে দেয়। যদি তা না পারে, তাহলে বাকশক্তি প্রয়োগে পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে পরিকল্পনা করবে কিভাবে অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা যায়, আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (বুখারী-মুসলিম)
উপর্যুক্ত হাদীস বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জিহাদের তিনটি স্তর বা পর্যায় বর্ণনা করেছে। প্রতিটি স্তরের জন্য জিহাদের কৌশল ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। হাদীস শরীফে সর্বনিম্ন ঈমানের শর্ত নির্ধারণ করে জিহাদের প্রথম স্তরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন বলে অভিহিত করেছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অন্যায়কে মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন হাদীসের বর্ণনা মতে প্রাথমিক স্তরের জিহাদ। দ্বিতীয় স্তর হলো মৌখিক শক্তি বা বাকশক্তির প্রয়োগ। অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে ফুটিয়ে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ঘৃণা ও ব্যাপক জনমত তৈরি করা এ স্তরের কাজ। বর্তমান সময়ে এ স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বর্তমান মতবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, মতবাদী ব্যবস্থার অপকারিতা সুস্পষ্ট করা এবং এসব মতবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকদের স্বরূপ
উন্মোচিত করা সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। এ দাবি পূরণের মাধ্যমেই গণচেতনা সৃষ্টি হবে। এবং গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে বাতিলের মূলোৎপাটনে চূড়ান্ত আঘাত হানা সম্ভবপর হবে। এজন্যই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অর্থ : জালিম শাসকের মোকাবেলায় সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ। (আবু দাউদ)

তৃতীয় পর্যায়ে আসে বাহুশক্তি প্রয়োগ। বাহুশক্তির দ্বারা চূড়ান্ত সংগ্রামকে বুঝানো হয়েছে। হক ও বাতিলের এ চূড়ান্ত সংগ্রামের লক্ষ্য হবে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং দীনে হককে বিজয়ী করা। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ধারাবাহিক পথ পরিক্রমায় হক-বাতিলের এ চূড়ান্ত সংগ্রাম কিতাল হিসেবে অভিহিত।

জিহাদের মাধ্যম বা উপকরণ (Media of Jihad)

দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথে ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদের মাধ্যমের ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। যেমন– কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অস্ত্র হচ্ছে বাহুশক্তি অর্থাৎ হাতিয়ার, কুটকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র। মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের অস্ত্র হচ্ছে প্রথমত বাকশক্তি তথা বক্তৃতা-বিবৃতি, যুক্তিতর্ক ও লেখালেখি প্রভৃতি এবং শেষ পর্যায়ের শক্তি প্রয়োগ।

জিহাদ শুধু তরবারির মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয় না। কুরআন-হাদীসে জিহাদের মাধ্যম হিসেবে ধন-সম্পদ, জান-প্রাণ, বাকশক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি উপকরণের বর্ণনা এসেছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

অর্থ : তোমরা সকলে জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। (সূরা সফ, আয়াত : ১০)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ : তোমরা সকলে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে। (সূরা তওবা, আয়াত : ৪০)

রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন–

وَجَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

অর্থ : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ, জান-প্রাণ ও বাকশক্তি (ভাষা ও সাহিত্য) দিয়ে। (আবু দাউদ)

অতএব, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ক্ষেত্রে উল্লিখিত সবকটি মাধ্যম ক্ষেত্রবিশেষ প্রযোজ্য হবে।

জিহাদের শর্ত (Essential Condition of Jihad)

ইসলামী জিহাদ নিঃসন্দেহে প্রচলিত মানবতাবিরোধী যুদ্ধ নয়। তাইতো ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জিহাদের আমল গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান। যে বিষয়ের মূল্য যত বেশি, সে বিষয়ের সঠিকত্বও তত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জিহাদের দুটি বিশেষত্ব অত্যন্ত বাস্তব। জিহাদের এ মর্যাদাপূর্ণ আমলটি সঠিক হওয়ার জন্য দুটি শর্ত অলংঘনীয়।

এক : ঈমান। দুই : ফী-সাবীলিল্লাহ।

পবিত্র কুরআন কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখিয়ে বলেছে–

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ : ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে। (সূরা সফ, আয়াত : ১৯)

অতএব, ঈমানের তাগিদে ও ঈমানের ভিত্তিতে জিহাদ হতে হবে। যে জিহাদের পশ্চাতে ঈমানের তাগিদ নেই এবং ঈমানের ভিত্তিতে যে জিহাদ পরিচালিত হয় না, তা কখনই ইসলামী জিহাদ হতে পারে না।

একইভাবে জিহাদের লক্ষ্য, পথ-পদ্ধতি হতে হবে ফী-সাবীলিল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর পথে। যে জিহাদের লক্ষ্য আল্লাহর দীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয় এবং যে জিহাদ ইসলামী শরীয়তের নিয়ম-নীতি, পন্থা-পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; তাকে ইসলামী জিহাদ নামে অবহিত করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

অর্থ : যারা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে; পক্ষান্তরে যারা কাফির, তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। (সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৬)

অতএব, ইসলামী জিহাদের বিশেষত্বকে প্রচলিত যুদ্ধের হিংস্রতা ও বিভৎসতা দিয়ে কলুষিত করার সুযোগ নেই। ইসলামী শরীয়তের মর্যাদাবান আমল হিসেবে জিহাদ স্ব-মহিমায় চির উজ্জ্বল।

জিহাদের প্রকারভেদ (Classification of Jihad)

জিহাদ আক্রমণাত্মক নাকি আত্মরক্ষামূলক- এ প্রশ্নের বিতর্ক সমধিক পরিচিত। এ ব্যাপারে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, সকল বিতর্কের অবসান ঘটাতে চাই এ কথা বলে যে, জিহাদের আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক উভয় অবস্থাই বিদ্যমান। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় শর্তের ওপর নির্ভর করেই জিহাদের প্রকৃতি কখনো আক্রমণাত্মক হয়; আবার কখনো আত্মরক্ষামূলক হয়।

প্রকৃতি (ঘধঃঁৎব) বিবেচনায় জিহাদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. আক্রমণাত্মক (Offensive)

২. আত্মরক্ষামূলক (Defensive)

আক্রমণাত্মক জিহাদ (Offensive jihad)

ইসলামী শরীয়তে আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া। আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম ইসলামী খিলাফতের পরবর্তী অবস্থাতে প্রযোজ্য। রাসূল সা.এর জীবনী থেকেই আক্রমণাত্মক জিহাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব, আক্রমণাত্মক জিহাদ পরিচালিত হয় ইসলামী খিলাফতের সংহতি ও মজবুতি বজায় রাখা এবং খিলাফতের পরিধি বিস্তৃত করার স্বার্থে। কোনো মুক্ত ভূখণ্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত রাসূল সা.এর জীবনে আক্রমণাত্মক জিহাদের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। যেমন– মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ প্রসঙ্গে যত আয়াত নাযিল হয়েছে, সেসব আয়াতকে যদি আক্রমণাত্মক জিহাদের দলীল হিসেবে পেশ করা হয়, তাহলেও এ কথা স্পষ্ট যে, এসব আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।

ইসলামী হুকুমতের ন্যায় নিরাপদ ভূখণ্ড তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কিতাল বা আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম নাযিল করেননি। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের বক্তব্য হলো– কিতাল বা

আক্রমণাত্মক জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। আবার অনেক ইসলামী চিন্তাবিদের মতে মাদানী সূরায় অবতীর্ণ কিতালের আয়াতসমূহ বাহ্যত আক্রমণাত্মক মনে হলেও আত্মরক্ষার জন্যই এসব জিহাদ পরিচালিত হয়েছে। যেমন– বদর যুদ্ধের পূর্বে প্রথম হিজরীর সারিয়ায়ে হামযা, সারিয়ায়ে উবায়দা, দ্বিতীয় হিজরীর গাযওয়ায়ে আবওয়া, গাযওয়ায়ে বাওয়াত, গাযওয়ায়ে উশাইরা এবং সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ প্রভৃতি জিহাদ অনেকের মতে আক্রমণাত্মক জিহাদ হিসেবে বিবেচিত। আবার অনেকের মতে এসব জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্রের হিফাযতের জন্য অথবা মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য সংঘটিত হয়েছে। এসব জিহাদকে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক যাই বলা হোক না কেন, নিঃসন্দেহে এসব জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্রের পরবর্তী অবস্থা এবং ফরজে কিফায়া। ফরজে কিফায়া হওয়ার কারণেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ এ জিহাদ পরিচালনা করেছেন।

একইভাবে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনকালে পরিচালিত সকল জিহাদ ফরজে কিফায়া। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাকে হেফাযত করার জন্যই এসব জিহাদ পরিচালিত হয়েছে। এ জিহাদের আহ্বান ছিল– কালিমা পড়, আল্লাহর প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্বকে মেনে নাও; নতুবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে (জিযিয়া) কর দিতে সম্মত হও। এ দুটির কোনোটিতেই সম্মত না হলে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত অবস্থা হলো তলোয়ারের মোকাবেলা করা।

অতএব, ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরই জিহাদের এ প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এসব জিহাদ আক্রমণাত্মক জিহাদ হিসেবে অভিহিত করলেও একে প্রচলিত যুদ্ধের অমানবিকতা ও নির্মমতা-নৃশংসতার সাথে তুলনা করা আদৌ সমীচীন হবে না। বস্তুত এসব জিহাদ পরিচালিত হয়েছে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও দাওয়াতকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে।

আত্মরক্ষামূলক জিহাদ (Defensive jihad)

আত্মরক্ষামূলক জিহাদ সর্বদাই ফরজে আইন। কাফির ও তাগুত শত্রুর আক্রমণে ঈমান, ইসলাম ও মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে আবাল-বৃদ্ধ- বণিতা সকলের জন্যই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে কুফরী

মতবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকলে, তাগুতি শাসনব্যবস্থা বহাল থাকলে, সেই ব্যবস্থাপনাকে উৎখাত করে আল্লাহর শাসন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ফরজে আইন। কেননা এ অবস্থাকে কোনোক্রমেই দারুল ইসলাম বলা যাবে না। খিলাফতের বিপর্যয়ের পর থেকে আজ অবধি ইসলাম শুধু মুসলিম ভূখণ্ডেই নয়; সারাবিশ্বে পরাজিত এবং বাতিল-কুফর শক্তি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, ইসলামকে পরাজিত অবস্থা থেকে বিজয়ী করার জিহাদ, সংগ্রাম ও আন্দোলন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। এখন জিহাদের এ ফরজ আদায় করার মানে এ নয় যে, ঢাল-তলোয়ার ও অস্ত্র নিয়ে ইসলামের শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে; বরং ইসলামকে তাগুতী এ সমাজ-সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখা এ জিহাদের দাবি। তাগুত ও কুফরের মোকাবেলায় ইসলামকে সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ প্রস্তুতি গ্রহণ সকল মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। ইসলামের এ পরাজিত অবস্থাতে কোনো ঈমানদারই দীন বিজয়ের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। বিপ্লবের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের সামগ্রিক কাঠামোর যেকোনো পর্যায়ে অংশগ্রহণ থাকলেই এ ফরজিয়াত আদায় হতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সুস্পষ্ট যে, এখানে ইসলাম সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে পরাজিত। অতএব, ইসলামবিজয়ের আন্দোলন-সংগ্রাম সকল ঈমানদারের জন্যই ফরজে আইন।

জিহাদের পরিধি (Scope of jihad)

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ কুরআনিক পরিভাষা। ব্যবহারিকভাবে একেই বলা হয় ইসলামী আন্দোলন। দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ তথা ইসলামী আন্দোলন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। যতদিন পর্যন্ত না দীন (ইসলাম) সকল মানবরচিত মতবাদের ওপর বিজয়ী হবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের এ পথ থেকে ঈমানদাররা নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবজাতিকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর কার্যক্রম শুরু হয়। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পাঁচটি পর্যায় রয়েছে। যথা–

১। আল্লাহকে প্রভু স্বীকার করা ও আল্লাহর পথে দাওয়াত। (Declare the Sovereignty of Allah and call the human beings in this path)
২। আল্লাহর পথে শাহাদাত। (Sacrifice ownself to the way of Allah)
৩। আল্লাহর পথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহ। (Step in the battle field against enemy)
৪। ইকামাতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা। (To acquire the State Power)
৫। আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার। (To purify the Nation)

অতএব, ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ করা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে যারা সংঘবদ্ধভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা সকলেই ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে রয়েছেন। একথা দ্বিধাহীনভাবে সত্য যে, শুধু মিছিল, মিটিং, জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামই ইসলামী আন্দোলন নয়; বরং তা'লীম-তারবিয়াত, তাযকিয়াহ, তাবলীগ, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহ সকল কাজই ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত। আবার এ কথাও সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, জালিমের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে রাজপথে যারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলেন তাদের মর্যাদা এবং যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের মর্যাদা সমান হতে পারে না। অতএব, ইসলামী বিপ্লবের জন্য মাঠে-ময়দানে তাগুত-কুফরের মোকাবেলায় যেমন সরব আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে, একইভাবে ব্যক্তিগঠন, সমাজসংস্কার ও কূটনৈতিক বিজয়ের মতো নীরব আন্দোলনের সমন্বিত প্রয়াসের নামই ইসলামী আন্দোলন। এসব আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ফরয আমল পালন করছেন– একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর গণ্ডির যেকোনো পর্যায়ে থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হোক না কেন– সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় শর্ত। সকল কাজের একটা সমন্বিত পরিকল্পনা থাকবে, একটা নির্ধারিত লক্ষ্য থাকবে; আর তা হলোদীনের বিজয় তথা ইসলামী সমাজবিপ্লব। ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের একক নেতৃত্ব থাকবে, যাকে ইমারত হিসেবে

গ্রহণ করে বৃহত্তর আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিপ্লবের উপাদান সরবরাহ হবে। যদি এ শর্তটি পালিত না হয় এবং তাগুত-কুফর শক্তির সাথে সমঝোতা-সহযোগিতার ভিত্তিতে দীনের শাখা-প্রশাখার খেদমত অব্যাহত থাকে, তাহলে উক্ত খেদমতকে ইসলামী আন্দোলন হিসেবে আখ্যা দেওয়া যাবে না। কেননা এ খেদমতের লক্ষ্য দীনের বিজয় নয়। এবং এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী সমাজবিপ্লবের প্রত্যাশা করাও হবে বোকামী। যে কাজের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া দীনের বিজয়ের জন্য না হবে, তাকে কিভাবে ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে?

প্রচলিত যুদ্ধ ও জিহাদের পার্থক্য
(Difference Between War and Jihad)

আন্তর্জাতিক আইন বিশারদদের মতে দুটি রাষ্ট্রশক্তি বা দুটি পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষকেই যুদ্ধ বলা হয়। সংজ্ঞা মতে যুদ্ধ হওয়া উচিত দুটি সমপর্যায়ের শক্তির মাঝে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, যুদ্ধ দুর্বলের ওপর সবলের চাপিয়ে দেওয়া হত্যাযজ্ঞ। একে একপাক্ষিক চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধও বলা যেতে পারে। অথচ জিহাদ হলো জুলুমের অবসানকল্পে নির্যাতিত ও মুক্তিকামী মানুষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও জীবনপণ সংগ্রাম। মাজলুমের পক্ষে যেহেতু জিহাদের আহ্বান সেহেতু এক্ষেত্রে জুলুম নির্যাতন ও অবৈধ
রক্তপাত অকল্পনীয়। এককথায় যুদ্ধ হলো হত্যাযজ্ঞ ও জুলুমের প্রতীক। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো নির্যাতিত মানবতার মুক্তির আহ্বান। তাইতো প্রচলিত যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভৎসতা আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে অভিশাপে রূপান্তরিত করেছে। ইতিহাসের প্রতিটি জাগতিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে চরম অমানবিকতা নৃসংশতা ও রক্তাক্ত অধ্যায়। যেমন ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।
ফরাসী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাস্তিল দুর্গের অন্ধকার কুঠুরীতে কত অজানা মাজলুমের বিদায়ী অভিবাদন সম্পন্ন হয়েছে, তা ইতিহাস লিখতেও ব্যর্থ হয়েছে। 'গেলোটিন' ফরাসী বিপ্লবের অগণিত হত্যাযজ্ঞের প্রতীক হিসেবে আজো পরিচিত। 'রক্তের বন্যায় মুছে গেছে প্রতিশোধ স্পৃহা'- ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী কমরেডদের ক্ষেত্রে এ কথাই অতি সত্য। পৈশাচিক রক্তপাত ও রুশ বিপ্লবের কালো অধ্যায় সকলের জানা। এককথায় প্রচলিত যে, সত্তর লক্ষ মানুষের রক্তের ওপরে গড়ে ওঠা

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রাশিয়াতে মাত্র সত্তর বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রশ্ন জাগে– কী দিল রুশ বিপ্লবের ধ্বংসলীলা?
আরো কিছু ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন, যা পাশবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসাত্মক চিত্রকে সুস্পষ্ট করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পারমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা কোনো সভ্যতাই ভুলতে
পারবে না। এছাড়াও আফগান ও ইরাকের ওপর যে একপাক্ষিক নিধনযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যুদ্ধের কোনো সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে না। তারপরও যদি একে যুদ্ধ বলা হয়, তাহলে এর পাশবিকতাকে নিঃসন্দেহে আধুনিক সভ্যতার চরম অভিশাপ হিসেবে অভিহিত করতে হবে। যুদ্ধ শুধু এ যুগেই নয়; সকল সময়েই ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ভয়াবহতা ইতিহাসের নির্মম দলীল হয়ে আছে।
এককথায় যুদ্ধ মানেই নির্মমতা ও ধ্বংসের প্রতীক। আইনবিদদের মতে যুদ্ধ নিতান্তই বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংঘটিত হয়। এর পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করে না; পাশবিক চাহিদাটাই এখানে মুখ্য। তাইতো যুদ্ধের ভয়াবহতা এতই নির্মম। পক্ষান্তরে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অতি মহান। মাজলুম মানবতাকে জুলুমের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতেই জিহাদের আহ্বান। জালিমের জুলুমের শৃঙ্খলে যদি শান্তিকামী মানবতা অবরুদ্ধ থাকে, অবিরামভাবে নির্যাতিত-নিস্পেষিত হতে থাকে, তাহলে সুন্দর সভ্যতা বিপর্যস্ত হবে– এটাই স্বাভাবিক জ্ঞানের কথা। আর সভ্যতাকে জালিমের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পরিত্রাণ দিতে মুক্তিকামী মানবতার পক্ষে জিহাদের আহ্বান আসে। এ চিত্রকে চিত্রায়িত করেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থঃ তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর পথে জিহাদ করছো না? সেসব নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলছে– আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিমের হাত থেকে মুক্তি দাও। আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

একইভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রদানে বাঁধার সৃষ্টি হলে এবং ঈমান ও ইসলামের ওপর কুফর তাগুতের সশস্ত্র আঘাত আসলে জিহাদের হুকুম রয়েছে। ইসলামী জিহাদের ক্ষেত্রে এ মহৎ লক্ষ্য উপস্থিত থাকার কারণেই প্রচলিত যুদ্ধের সাথে জিহাদের কোনো তুলনাই হয় না। পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, যুদ্ধ ও জিহাদের উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করায় উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রচলিত যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। তার বিপরীত জিহাদের কল্যাণকামী সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে রাসূল সা. কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধসমূহের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো। হযরত মুহাম্মাদ সা.এর দীর্ঘ ১০ বছরে সংঘটিত যুদ্ধের সংখ্যা ৬৬টি। এ যুদ্ধসমূহের মুসলিম পক্ষ ও কাফির পক্ষের সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা এক হাজারেরও কম, যা প্রচলিত যুদ্ধে আশা করাটা একেবারে অকল্পনীয়। যদি রাসূল সা.এর যুদ্ধ-জিহাদকে প্রচলিত যুদ্ধের সাথে তুলনা করার ধৃষ্টতা দেখানো হয়, তাহলে পরিসংখ্যানের মধ্যেই ধৃষ্টতা সমাধানের জবাব রয়েছে।
অতএব রাসূল সা. সংঘটিত জিহাদ প্রচলিত রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞ নয়; বরং মানবতার মুক্তির জন্য জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের প্রতিরোধ পদক্ষেপ।

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Jihad Fesabilillah)

দীন কায়েমের শাশ্বত পথ জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ। দীনে হক (ইসলাম) বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে পরাজিত। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ইসলাম– সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। অতএব, দীনে হককে পরাজিত অবস্থা থেকে বিজয়ী করতে যত প্রস্তুতি অর্জিত হবে, যত কর্মসূচি পালিত হবে, সকল সংগ্রাম ও কর্মসূচিই জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত।
কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَ الَّذِىٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ وَلَوۡكَرِهَ الۡمُشۡرِكُوۡنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ ☆ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَتُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَاَنۡفُسِكُمۡ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ☆ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ☆ وَاُخۡرٰى تُحِبُّوۡنَهَا نَصۡرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتۡحٌ قَرِيۡبٌ وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

অর্থ : রাসূলকে হিদায়েত (পথ নির্দেশ) ও দীনে হক (সত্য জীবনব্যবস্থা) দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যাতে সে অপরাপর সকল দীনের (মতবাদের) ওপর দীনে হক (ইসলাম)কে বিজয়ী করে দেন। এটা মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক।
হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি লাভজনক ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দিবে। তা হলো– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। (সূরা সফ, আয়াত : ৯-১০)
আলোচ্য আয়াতে দীন বিজয়ের পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে শাশ্বত পদ্ধতির বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াতে আল্লাহর পথে জিহাদ দ্বারা জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর শাশ্বত পথ ও পদ্ধতিকেই বুঝানো হয়েছে। এ পথের একাধিক পর্যায় বা স্তর রয়েছে। কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহও এ পথেরই একটি পর্যায়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে চূড়ান্ত স্তর পর্যায়ের সমন্বিত নাম জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ। দীন কায়েমের লক্ষ্যে রচিত জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর এ চিরন্তন পথেই একদিন বিজয় আসবে; পৌঁছানো যাবে চূড়ান্ত মনজিলে। তবে সময়, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর বিভিন্ন পর্যায় কার্যকর হয়। আল্লাহর পথে জিহাদ যেহেতু অতি মর্যাদাপূর্ণ আমল, সেহেতু এ আমলের জন্য শরীয়তের নির্দেশনাও কঠোরভাবে অনুসরণীয়। সময়, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কৌশল অবলম্বন এ আমলের ক্ষেত্রে দূরদর্শীতা বলে বিবেচিত হয়। ব্যতিক্রম হলে ফিতনার কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথ কণ্টকাকীর্ণ, জুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নে পরিপূর্ণ। এ পথে আছে আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য, আছে আদর্শের প্রতি অবিচলতা। এ পথে নেই আপসকামিতা, নেই তাগুতের সাথে সখ্যতা। এ পথের পরিচয় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা চিন্তানায়কের নিজস্ব

দর্শনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না; কুরআন নিজেই এ পথের পরিচয় বর্ণনা করেছে।
ইরশাদ হচ্ছে–

اَنِ اعۡبُدُوۡ اللّٰهَ وَاجۡتَنِبُوۡا الطَّاغُوۡتِ

অর্থ : আল্লাহর ইবাদত করো, তাগুতের সংসর্গ পরিহার করো। (সূরা নাহল, আয়াত : ৩৬)

অতএব, কুরআন নির্দেশিত ও বৈশিষ্ট্যায়িত পথই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনীর জন্য অনুসরণীয়। দীন কায়েমের লক্ষ্যে ঘোষিত পথ যদি তাগুতের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, এ পথের দিগন্ত যদি বাতিলের সাথে একাকার হয়ে যায়; তখন এ পথ শুধুই ভ্রান্তির মরীচিকায় হাবুডুবু খায়। সত্য-সন্ধানীদের এ পথ চিনতে কোনোই তাকলীফ হয় না। (আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, দীন আসবে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথে। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে বাতিল ও তাগুতের কবর রচনার লক্ষ্যে আপসহীনভাবে আমরণ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় অব্যাহত থাকবে আমাদের পথচলা।)

জিহাদ কেন? (Oblingation of Jihad)

দীন এসেছে বিজয়ী হওয়ার জন্য, পরাজিত অবস্থায় থাকার জন্য নয়। দীন বিজয়ের জন্য প্রয়োজন বাতিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রামের এ অবিরত কর্মসূচির নামই জিহাদ। এ জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাতিলের চির অবসান হয় এবং আল্লাহর মনোনীত দীন কায়েম হয়।
কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَاتِلُوۡهُمۡ حَتّٰى لَاتَكُوۡنَ فِتۡنَةٌ وَّيَكُوۡنَ الدِّيۡنُ لِلّٰهِ

অর্থ : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে, যতক্ষণ না ফিতনা (তাগুত ও বাতিল) নির্মূল হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৩)

দীনের বিজয় ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাগুত-বাতিল ও কুফর শক্তির অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দীনের আওয়াজকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ

অর্থ : জিহাদ (সশস্ত্র সংগ্রাম) তোমাদের জন্য ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

জমিনের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ, জুলুম-নির্যাতনের ধারা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে, যদি না এসবের মোকাবেলায় জিহাদের আমল বর্তমান থাকে। জিহাদের আমল জমিনের মধ্যে যাবতীয় জুলুম-নির্যাতনের মূলোৎপাটন করে শান্তির স্রোতধারা প্রবাহিত করে। জালিমের জুলুমের প্রাচীর যখন শান্তিকামী-মুক্তিকামী মানবতাকে বন্দীত্বের কারাগারে আবদ্ধ করে ফেলে, সে নির্দয় শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে জিহাদের আমল আসে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বন্দীত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে সত্য-ন্যায়ের স্রোতধারাকে বহমান করতে জিহাদের বিকল্প নেই। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতাকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখায় ইসলাম।
কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَالَكُمۡ لَاتُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَالۡمُسۡتَضۡعَفِيۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالۡوِلۡدَانِ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ
رَبَّنَا اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا وَاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًا وَّاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِيۡرًا

অর্থ : তোমাদের কী হলো– কেন তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছো না ঐসব নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে এই বলে যে, আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ড থেকে মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

অন্যায়ের মূলোৎপাটন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জিহাদের আমল চিরন্তন ও শাশ্বত ইলাহী নিজাম। তাইতো মানবতার মুক্তির দূত রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন–

اَلۡجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيَامَةُ

অর্থ : জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের উপস্থিতি বিশ্বব্যবস্থায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অদ্বিতীয় সমাধান।

জিহাদের ফজিলত (Benifit of Jihad)

ইসলামী শরীয়তে জিহাদের ফজিলত সর্বোচ্চ। আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদের আমলকে সকল আমলের চেয়ে উঁচু ও মর্যাদাবান আমল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। নিম্নে জিহাদের বিশেষ বিশেষ ফায়ায়েল উল্লেখ করা হলো–

জিহাদের পুরস্কার-জান্নাত ও বিজয় : জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথে বিজয় অথবা পরাজয়

উভয়টার জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

অর্থ : যে আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ অথবা গাজী হবে, তাদেরকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার দেওয়া হবে। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৪)

জিহাদের আমলের মাধ্যমে বান্দাহ তার প্রভুর নিকট থেকে যেসব পুরস্কার ও সফলতা পেয়ে থাকে, তার মধ্যে জান্নাতপ্রাপ্তি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও দুনিয়ার বিজয় উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে রয়েছে গুনাহ মাফের ঘোষণা ও অগণিত নিয়ামত প্রদানের প্রতিশ্রুতি।

কুরআনুল কারীম ঘোষণা করেছে–

وَمَنْ يُّقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিবে। তা হলো তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (এ কাজের ফলে) আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। তোমাদেরকে আরো একটি পুরস্কার দেওয়া হবে– যা তোমরা প্রত্যাশা কর। তা হলো, দুনিয়ার সাহায্য ও বিজয়। (সূরা সফ, আয়াত : ১০-১৩)

জিহাদ সর্বোচ্চ ইবাদত : জিহাদ সর্বোচ্চ ইবাদত ও আল্লাহপাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল। কুরআনপাকে ইরশাদ হচ্ছে–

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا هَـلْ اَدُلُّـكُـمْ عَـلٰـى تِـجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمَ (وقف) تُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَا لِكُمْ خَيْرُلَكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الخ)

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মত সংঘবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন। (সূরা সফ, আয়াত : ৪)

হাদীস :

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ النَّبِى (صلى) اَىُّ الْعَمَلُ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

হযরত আবুযর গিফারী রা. বর্ণনা করেছেন– আমি জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! সা. কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীর তুলনা হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি অবিরাম

নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে, একটি মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুজাহিদ প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করে

আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখার মর্যাদা বর্ণনা করে হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

عَنْ اَنَسٍ اِبْنُ مَالِكٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ (صلى) قَالَ لَغُدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةُ خَيْرُ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا

অর্থ : হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন– একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল আল্লাহর পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পার্থিব সকল বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযী)

রাসূল সা. আরো বলেছেন–

مَنْ غَبَرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلىٰ النَّارِ

অর্থ : যে বান্দাহর দু'পা আল্লাহর পথে ধুলি ধুসরিত হবে, জাহান্নামের আগুন তার দু'পাকে স্পর্শ করবে না। (বুখারী)

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথে আমৃত্যু সংগ্রামে টিকে থাকার গুরুত্ব উল্লেখ পূর্বক হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

قَـالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَى) مَنْ فَصَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَاتَ اَوْقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ اَوْوَقَصَهُ فَرَسُهٗ
اَوْ بَصِيْرُهٗ اَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ اوْمَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ وَبِاَىِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فِاِنَّهٗ شَهِيْدٌ وَاِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থ : রাসূল সা. বলেছেন– যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়, সে যে অবস্থায়, মারা যাক যেমন– যুদ্ধক্ষেত্রে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে অথবা বিছানায় শুয়ে সর্বাবস্থায় সে শহীদ হবে এবং নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। (আবু দাউদ)

জিহাদ ফরজ আমল : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আমল। জিহাদ শুধু ফরজ আমলই নয়, এটা ঈমান ও আমলের সংরক্ষকও বটে। জিহাদকে ফরজ ঘোষণা করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

অর্থ : তোমাদের জন্য জিহাদকে ফরজ করে দেওয়া হলো। (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

অতএব, দীন বিজয়ের লক্ষ্যে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য বাধ্যতামূলক।

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিণাম : জিহাদের আমল ঈমানদারকে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে। কে প্রকৃত ঈমানদার ও জান্নাতী, জিহাদই তা নির্ধারণ করে। অতএব, আল্লাহর দীনের বিজয় ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জিহাদের আমল যে করবে না, সে কী করে জান্নাতের প্রত্যাশী হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে–

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ : তোমরা কি মনে করছো যে, এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি, (পরীক্ষা করেননি) কে আল্লাহর পথে প্রাণপণ সংগ্রামরত এবং কে এ পথে ধৈর্যশীল। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৪২)

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত জান্নাতীদের পরিচয় তুলে ধরেছে। উপর্যুক্ত আয়াত এ ঘোষণাই দিয়েছে যে, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথে অবিরাম সংগ্রাম-আন্দোলনের পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারলে জান্নাত অবধারিত। জিহাদ না করার কঠোর পরিণতি বর্ণনাপূর্বক আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

অর্থ : তোমরা যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের না হও, তবে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হবে, তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হবে। (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৯)

জিহাদ পরিত্যাগ করার কঠোর পরিণতি বর্ণনাপূর্বক হযরত আবুবকর (রা.) আরো বলেছেন–

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ لَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ

অর্থ : যদি তোমরা জিহাদকে পরিত্যাগ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপর কঠিন আযাব চাপিয়ে দিবেন।

উক্ত হাদীসের প্রতিফলন আজ গোটা বিশ্বে দৃশ্যমান। দীনের বিজয় ও সংরক্ষণের একমাত্র হাতিয়ার জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ। এ পথ থেকে মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন থাকার কারণেই আজ আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়াবহ শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ কুফর-তাগুত ও বাতিলের চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ। হাদীস শরীফে নবী করীম সা. জিহাদ ত্যাগকারীকে মুনাফিক হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন।

হুজুর সা. ইরশাদ করেছেন–

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ

অর্থ : যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, জিহাদের নিয়ত করেনি; এমন কি জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেনি, তার মৃত্যু হবে মুনাফিকের মৃত্যু। (মুসলিম)

অতএব, ঈমান ও আমলের হেফাযতের জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রাম-মুজাহাদার বিকল্প নেই।

শাহাদাত সর্বোত্তম নিয়ামত : শাহাদাত আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সর্বোত্তম নিয়ামত। শাহাদাতের মৃত্যু হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে ক্ষমার ঘোষণা; আরো পাওয়া যায় জান্নাতের অবধারিত শান্তিধারা। যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করে তাদেরকেই শহীদ বলা হয়।

শহীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءُ (لقول)

অর্থ : যারা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়, তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৬৯)

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, হাদীস শরীফে উপর্যুক্ত আয়াতের মোহময় শানেনুযূল বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. তাঁর সঙ্গীদের সম্বোধন করে বললেন– তোমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে জান্নাতী সবুজ পাখীদের অভ্যন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। তারা জান্নাতের নদী-নালার ওপর উড়ে বেড়ায় এবং ফলমূল ভক্ষণ করে। আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ঝাড়বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করল, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলতে লাগল; আহ! কে আমাদের ভাইদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দিবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত ও পরমানন্দে আছি। আমাদের এ সংবাদ শুনে দুনিয়াবাসী ভাইয়েরা যাতে জান্নাত লাভে আগ্রহী হয় এবং জিহাদের ময়দান থেকে পশ্চাদপদ না হয়। বেহেশতবাসীদের এ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আল্লাহ নিজেই বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে সংবাদ পৌঁছে দিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।
উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহর পথে জিহাদ ও জিহাদের পথে অবিচল থেকে শহীদ হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার মর্যাদা লেখনী ও বক্তব্যের ভাষায় শেষ করা যাবে না। আমলী জিন্দেগীর মাধ্যমে এ পথের গুরুত্বকে উপস্থাপন করাটাই সঙ্গত। অতএব, দীন বিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম-আন্দোলনে অবিচল থেকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের জীবনের সাধনা; এ পথে লড়তে লড়তে শাহাদাতের পেয়ালা পান করাই হোক আমাদের জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা।

জিহাদ কিভাবে? (Jihad in What Way?)

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর লক্ষ্য হচ্ছে দীন কায়েম করা। তাই দীন কায়েমের লক্ষ্যে জান-মাল ও সময়ের কুরবানী করাকেই জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ বলা হয়। দীন যেখানে পরাজিত, সেখানে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর এ লক্ষ্যই মুখ্য। দীন যেখানে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কোনো ভূখণ্ডে যখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখনও জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর কাজ অব্যাহত থাকে। এক্ষেত্রে জিহাদের প্রকৃতি হয় ভিন্নরকম। ইসলামী হুকুমতের

আমানতকে সর্বাবস্থায় হেফাযত করার জন্য সীমান্তপ্রহরী নিয়োজিত থাকে, যাকে রিবাত বলা হয়। আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরার কাজ অনেক বড় দামি ও মর্যাদাপূর্ণ।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে–

عَيْنَانِ لَاتَعَسَّهُمَا النَّارَ عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰه وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرَسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ : রাসূল সা. বলেন, দুটি চক্ষুকে দোজখের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না, একটি চক্ষু– যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করবে; দ্বিতীয় চক্ষু– যে আল্লাহর পথে প্রহরীর কাজ করবে। (তিরমিযী)
আবার ইসলামী হুকুমতের ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করেও জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর কাজ অব্যাহত থাকে। জিহাদ ফী–সাবীলিল্লাহর এ পর্যায়ে দীনের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে হুকুমত সম্প্রসারিত হয়। এ পর্যায়ে কুফর-তাগুত শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। একেই বলা হয় কিতাল। কিতালের দুটি উদ্দেশ্য থাকে। যথা–
১। কুফর-তাগুত শক্তি যাতে ইসলামী হুকুমতের ওপর আক্রমণ করতে না পারে এবং আক্রমণের শক্তি পর্যন্ত অর্জন করতে না পারে, সে লক্ষ্যে আগ বাড়িয়ে শত্রুর শক্তির অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এটা ইসলামী হুকুমতের পররাষ্ট্রনীতিও বটে। এ নীতিকে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক উভয় বিশেষণে বিশেষিত করা যেতে পারে। কিতালের এ অবস্থা ফরজে কিফায়া।
ইসলামী হুকুমতের শক্তি কম থাকার কারণে কুফর-বাতিল শক্তি তথা শত্রুবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এ আশঙ্কা যখন বাস্তবরূপ লাভ করে, তখন আত্মরক্ষার্থে শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলা করতে হয়। একেও কিতাল বলা হয়। কিতালের অবস্থা শত্রুবাহিনীর শক্তি, আক্রমণের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিবেচনায় ইসলামী হুকুমতের অধীনে বসবাসকারী ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য ফরজে আইন অথবা ফরজে কিফায়া উভয়ের যেকোনো একটি হতে পারে। তবে খলিফার নির্দেশেই কেবল এ কিতাল পরিচালিত হবে।

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ধারাবাহিকতা
(Steps of Jihad Fe-Sabilillah)

বাতিলের মূলোৎপাটন ও হকের প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ। যেখানে দীনে হক পরাজিত অবস্থায় আছে, সেখানে দীনে হককে পরাজিত অবস্থা থেকে বিজয়ী অবস্থায় নিয়ে আসতে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর ধারাবাহিক পথ পরিক্রমা কিরূপ হবে– সেটাই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। বাতিল, কুফর, তাগুত ও জাহিলিয়াতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রাসূল সা.এর নবুয়্যতী মিশনের চূড়ান্ড় লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে–

মুশরিকরা যতই অসন্তোষ প্রকাশ করুক। (সূরা সফ, আয়াত : ৯)

দীন প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রাসূলকে করতে হয়েছে সমাজসংস্কার ও ব্যক্তিসংস্কারের বিভিন্নমুখী কাজ।

কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

عَيْنَانِ لَاتَعَسَّهُمَا النَّارَ عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰه وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা; যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি (রাসূল) তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা জুম'আ, আয়াত : ২)

বস্তুত দীন প্রতিষ্ঠার পথ-পরিক্রমার নাম জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ। এ পথের প্রকৃতি ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمَ ☆ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَا لِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَا لِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☆ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهَارُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ☆وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌمِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দিবে। আর তা হলো– আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও

জান-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (এ পথে চলার ফলস্বরূপ) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, তোমাদেরকে এমন জান্নাত দেওয়া হবে, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত এবং জান্নাতে উত্তম রিযিক প্রদান করা হবে, এটাই তোমাদের জন্য মহা-সফলতা। তোমাদেরকে আরো একটি পুরস্কার দেওয়া হবে– যা তোমরা পছন্দ কর; তা হলো দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় বস্তুত মোমিনদের জন্যই সু-সংবাদ। (সূরা সফ, আয়াত : ১০-১৩)

অতএব, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর এ পথেই রয়েছে আখেরাতের মুক্তি ও দুনিয়াতে কাঙ্ক্ষিত বিজয়। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে রাসূল সা. তাঁর নবুয়্যতী জিন্দেগীতে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পরিপূর্ণ অবকাঠামো চিত্রায়িত করে উম্মতের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে তা রেখে গেছেন। একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে যদি দীনে হক পরাজিত থাকে, সে অবস্থাতে দীনে হককে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর যে ধারাবাহিক পথ-পরিক্রমা অতিক্রম করতে হয়, আল্লাহর রাসূলের নবুয়্যতী জীবনে সে পথ স্পষ্ট। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূল সা.কে তাঁর জীবনে জিহাদের সব কয়টি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। আজো এ সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা যেখানে দীনে হক (ইসলামী জীবনব্যবস্থা) পরাজিত; এ অবস্থাতে দীনে হককে অপরাপর সকল মতবাদ-মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করার জন্য গোটা উম্মতকে রাসূল সা.এর প্রদর্শিত সে পথ-পরিক্রমায় সামনে চলতে হবে। রাসূল সা.প্রদর্শিত এ জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ শুরু হয়েছে এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। রাসূল সা. বলেন–

يَااَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ : হে মানবজাতি! তোমরা স্বীকার করে নাও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাহলেই তোমরা সফলকাম।

অতঃপর উপহাস, অত্যাচার, নির্যাতন, নির্বাসন ও হিজরত ইত্যকার ধারাবাহিক পথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর কার্যক্রম এগিয়ে চলে। চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে হক-বাতিলের প্রত্যক্ষ লড়াই বা কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহ। কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর পূর্বে তা'লীম-তারবিয়াত, তাযকিয়াহ,

তাবলীগ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তুতিপর্বের বিভিন্ন পর্যায়ে উপহাস, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, নির্বাসন ও হিজরতের উপস্থিতি বর্তমান সময়েও আসবে, যেমনিভাবে রাসূল সা.এর চলার পথে এসেছে। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর এ ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর আমল আসতে পারে না। যদি উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতাকে গুরুত্বহীন মনে করা হয় এবং কিতালকে কওমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ফিতনার সৃষ্টি হবে। আর ফিতনার জন্য অতি উৎসাহী ও অদূরদর্শী চিন্তানায়করাই দায়ী হবেন। কওমের ঘাড়ে এ বোকামীর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক হবে। কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর আমল কোন পরিবেশে করা যাবে এবং কিতালের কোন অবস্থাতে ফরয হয়েছে তার কিছু দালিলিক আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম বা কিতালের অনুমতি পাওয়া যায়নি। অথচ হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের অবস্থা ছিল চরম মাজলুমী অবস্থা। কুফর ও তাগুত শক্তির অত্যাচার নির্যাতনে ঈমানদারগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং এ অবস্থার প্রতিকারও কামনা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি মেলেনি। মক্কী জীবনের চরম মাজলুমী জিন্দেগীতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন তাঁর প্রিয় হাবীব সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা.কে প্রতিরোধের অনুমতি ও হুকুম প্রদান করেননি, তার উপলব্ধি পবিত্র কালামের মক্কী আয়াতসমূহ থেকে নেওয়া খুবই সহজ। মক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাবারক তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল সা. কে লক্ষ্য করে বলেন–

وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

অর্থ : ধৈর্যধারণ করুন। আপনার এ ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহর জন্যই। ওদের ব্যাপারে দুঃখবোধ করবেন না এবং আপনার বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করে, সে কারণে আপনি মনে কুণ্ঠিতও হবেন না। (সূরা নাহল, আয়াত : ১২৭)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

অর্থ : ধৈর্যধারণ করুন। ওরা যা কিছু বলে সে ব্যাপারে এবং ওদেরকে খুব সুন্দরভাবে (কৌশলে) পরিহার করে চলুন। (সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত : ১০)

আল্লাহর রাসূলকে প্রচণ্ড আত্মবল সহকারে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَاتَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ

অর্থ : ধৈর্যধারণ করুন। যেমন অতীব আত্মশক্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আর ওদের (কুফর-বাতিল শক্তি) ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করবেন না। (সূরা আহকাফ, আয়াত : ৩৫)

মক্কায় অবতীর্ণ এসব আয়াত সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মক্কী জিন্দেগীতে রাসূলে কারীম সা. ও তাঁর সাথীদেরকে কুফর-তাগুতি শক্তির অমানবিক জুলুম নির্যাতন নীরবে সইতে হয়েছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনো প্রক্রিয়া তারা গ্রহণ করতে পারেননি অথবা করার অনুমতি পাননি। যেহেতু অনুমতি পাওয়া যায়নি, সেহেতু ইচ্ছামত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না।

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর পথে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও নির্বাসনের পথ পেরিয়ে এক পর্যায়ে আসে হিজরতের আমল। মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাতে জালিম-বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম তথা কিতালের অনুমতি মুসলমানদেরকে দেওয়া হলো।

আল্লাহ তা'আলা কালামেপাকে ঘোষণা করেন–

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ☆
اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَااللّٰهُ☆

অর্থ : সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকেও যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ তো তাদের সাহায্যে খুবই সক্ষম। তারাতো সেই লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে ও অকারণে বহিস্কৃত হতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিলো যে, তারা বিশ্বাস করত ও মুখে বলত যে আমাদের রব আল্লাহ। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৩৯-৪০)

আয়াতটিতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যুদ্ধকে মুসলমানদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই জালিম ও যুদ্ধবাজ কুফর শক্তির

বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের অনুমতি মুসলমানদেরকে দেওয়া হলো। মক্কায় অবস্থানকালে কাফিরদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হওয়ার কারণে রাসূল সা.এর নিকট মাজলুম সাহাবায়ে কেরাম সে বিষয়ে অভিযোগ পেশ করতেন এবং প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন করতেন। জবাবে রাসূল সা. বলতেন, যুদ্ধ করার কোনো অনুমতি বা নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি; বরং সবর ইখতিয়ারই তোমাদের করণীয়।

উপর্যুক্ত আয়াতে আমরা দেখতে পাই, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর মতে সশস্ত্র জিহাদ পর্যায়ে এটাই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত। আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে– তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানরা নির্যাতিত। এমনটাই মাজলুম যে, শেষ পর্যন্ত নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে বসবাসের জন্য নিরাপদ ভূখণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, আয়াতে হিজরতকেই সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দানের ভিত্তি হিসেবে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম বা প্রতিরোধ যুদ্ধের দুটি শর্ত পূরণ হয়েছে।

প্রথমত : মদীনায় হিজরত করার কারণে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানরা একত্রিত ও সু-সংহত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এতে করে শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সংঘবদ্ধ ও সু-সংহত হওয়ার মধ্য দিয়ে কাম্যমানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ায় মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ-সংগ্রামের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানগণ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ও নিরাপদ ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছে। এখন এ নিরাপদ ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে অধিকতর শক্তি সঞ্চয়, নিরাপদ ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা ও শত্রুর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চলবে।

উল্লেখ্য যে, কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর জন্য উপর্যুক্ত দুটি উপাদান একান্তই অপরিহার্য। উপাদানদ্বয়ের কাম্যমানের উপস্থিতি না থাকায় মক্কী জীবনে কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়নি; কিন্তু তখনও জিহাদের অনুমতি ছিল। তবে এ জিহাদ অস্ত্রের জিহাদ নয়; এ জিহাদ ছিল দীনের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের জিহাদ। দীনের প্রচার, প্রসার ও তাগুত-বাতিল শক্তির মুখোশ উন্মোচনের লক্ষ্যে যুক্তি-প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক দলিল উপস্থাপন এবং বিতর্ক,

বাকশক্তি, লেখনীর শক্তি প্রয়োগ প্রভৃতি ছিল এ জিহাদের মাধ্যম। মক্কী জীবনে রাসূল সা.কে কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়নি; কিন্তু মাদানী জীবনের শুরুতেই কিতালের অনুমতি প্রদান করা হলো। মদীনায় রাসূল সা.এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিতান্ত প্রতিরক্ষার স্বার্থেই কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াতে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

অর্থ : আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদার লোকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা তিনি বিশ্বাসঘাতক কাফিরদের আদৌ পছন্দ করেন না। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৩৮)

কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর অনুমতি দানের কয়েক মাস পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯০)

কিতালের উপর্যুক্ত আয়াতেও শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, শত্রুপক্ষ তোমাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করলে তার প্রতিরোধ মোকাবেলার নির্দেশ দেওয়া হলো। এ নির্দেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ না করলে নিজেদের পক্ষ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে না। ধারাবাহিকভাবে কিতালের আমল সীমিত গণ্ডি ও শর্তের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসে। এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিতালের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। একপর্যায়ে কিতালকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থ : কিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয় মনে হয়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের বক্তব্য হলো, কিতাল ফরজে কিফায়া। কেননা, সবসময় ও সর্বাবস্থায় যেহেতু কিতাল ফরজ নয়, সেহেতু এটা ফরজে আইন না হয়ে ফরজে কিফায়া হবে। রমযান মাসে রোজা ফরজ, একইভাবে পরিবেশ পরিস্থিতি ও শর্তসাপেক্ষে কিতাল ফরজ। অতএব, দীন বিজয়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ফরজে আইন। আর কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহ শুধু যুদ্ধক্ষম লোকদের জন্য কর্তব্য। এজন্য এটা ফরজে কিফায়া। তবে উল্লেখ্য যে, মুসলিম ভূখণ্ড বা ইসলামী রাষ্ট্র যখন কুফর-বাতিল শক্তির সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়, তখন কিতাল ফরজে আইন হয়ে যায়। কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর তৃতীয় পর্যায়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের হুকুম এসেছে। কাফির-মুশরিকদের সংগঠিত শক্তি নিশ্চিহ্ন করে ভবিষ্যত বিপদের সকল আশংকাকে মিটিয়ে দিতে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ যুদ্ধ মুসলমানদের পক্ষ থেকে শুরু হবে। মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনপাকে ইরশাদ হচ্ছে–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَ شْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

অর্থ : হারাম মাসসমূহ অতিক্রান্ত হলেই তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানেই পাও। তাদেরকে পরিবেষ্টিত কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতেই তাদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য ওঁত পেতে বসে থাক। (সূরা তওবা, আয়াত : ৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَا تِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً

অর্থ : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা কর। (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৬)

অতঃপর দীন ইসলামকে গ্রহণ করেনি যেসব আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

অর্থ : তোমরা যুদ্ধ কর সেই সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা এক আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনেনি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে যারা হারাম গণ্য করে না এবং সার্বিকভাবে আল্লাহর প্রেরিত সত্য দীন পালন করে না। (সূরা তওবা, আয়াত : ২৯)

উপর্যুক্ত আয়াত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত তাগুত শক্তির মোকাবেলায়ও প্রযোজ্য হবে। সর্বাত্মক যুদ্ধের হুকুম প্রদানপূর্বক কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

অর্থ : আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, যে পর্যন্ত না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থ : ফিতনা কিতালের চেয়েও মারাত্মক।

অতএব, আল্লাহর জমীনে যাতে ফিতনা সৃষ্টিকারীর অস্তিত্ব না থাকে, সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক জিহাদের হুকুম এসেছে। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর এ পর্যায়ে দাওয়াতের প্রকৃতি হবে– ঈমান গ্রহণ করো, নতুবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। জিযিয়া কর দাও। দুটি শর্তের একটিও গ্রহণ না করলে তৃতীয় আহ্বান হবে, তলোয়ারের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হও।

বস্তুত জমীন থেকে ফিতনার চির অবসান এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সর্বাত্মক জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ না করবে, ইসলামী জীবনব্যবস্থার সাথে সহাবস্থান মেনে না নিবে; প্রকারান্তরে তারা জমীনের মধ্যে ফিতনাই সৃষ্টি করবে। অতএব, এসব ফিতনা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধই যুক্তিযুক্ত। কিতাল ফী–সাবীলিল্লাহর সর্বশেষ পর্যায় হলো বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত-নিস্পেষিত মাজলুম মানবতাকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবার লক্ষ্যে সকল সাম্রাজ্যবাদ ও জালিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। নিঃসন্দেহে এটা ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ এবং খিলাফতব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হলেই কিতালের এ পর্যায়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব। কোনো ভূখণ্ডে জালিম কর্তৃক নির্যাতিত জনগোষ্ঠী অথবা অশান্ত বিশ্বব্যবস্থায় জালিম রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত প্রতিরক্ষায় অক্ষম কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের আহ্বানে সাড়া দিতে কিতালের এ পর্যায়ে অবতীর্ণ হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে আযাদচেতা ঈমানদারগণের প্রতি। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থ : তোমাদের কী হলো– কেন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছ না। ঐসব নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে; যারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ড থেকে মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

আল্লাহর সৃষ্টি এ পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কোনো বান্দাহ মাজলুমী হালতে থাকবে, নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হবে, ঈমানদারদের রক্তে এ জমীন রক্তাক্ত হবে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। এজন্য স্বাধীনচেতা, মুক্তিকামী, ঈমানদার মুসলিম মিল্লাতের প্রতি জোরালো ও উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। দুনিয়ার একপ্রান্তে যখন কোনো মুসলমান জালিমের জুলুমের শিকার হয়, অপর প্রান্ত থেকে মুসলিম ভাইয়ের জান-মাল ইজ্জত রক্ষার্থে মুসলিম মিল্লাতের কণ্ঠ গর্জে উঠবে। জালিমকে প্রতিহত করতে এবং গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙ্গতে গর্জে উঠবে হকের তলোয়ার। জালিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঈমানদারদের বুলেটের নিশানা। কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর এ পর্যায়ের আমল গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি অবশ্য কর্তব্য। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেই কেবল এ আমলের পরিপূর্ণ হক আদায় সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ ও কিতাল ফী-সাবীলিল্লাহর

বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও অবস্থান সম্পর্কে দালিলিক যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত জিহাদ ও কিতালের এ পর্যায়সমূহ কুরআনে পাকের আয়াত নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা ও রাসূল সা.এর নবুয়্যাতী জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্রমিকতা থেকে যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। দীন বিজয়ের লক্ষ্যে রাসূল সা.

প্রদর্শিত এ ধারাবাহিক পথ-পরিক্রমাই গোটা উম্মতের জন্য নিদর্শন। এটাই জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর সুন্নাত তরীকা। এটাই ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ।

সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতি (More Preparation for Jihad)

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শর্ত। দীন কায়েমের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণকে ফরজ করা হয়েছে। প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থ: তোমরা শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া (সংগ্রামের উপকরণ) প্রস্তুত রাখো, যাতে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শংকিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পারো। (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬০)

অতএব, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি জরুরী। এ প্রস্তুতি তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। যথা :

১। লোকবল সংগ্রহ ও তৈরি।

২। উপকরণ সংগ্রহ ও সময়োপযোগী ব্যবহার।

৩। চূড়ান্ত সংগ্রামের পদক্ষেপ।

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্য লোকবল বৃদ্ধি করা এবং লোকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা জরুরী। জনবল তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সামরিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তি তথা ঈমানী শক্তিই বেশি কার্যকর। সংগৃহিত জনগোষ্ঠীকে আদর্শ ও কর্মসূচির আলোকে মানসিকভাবে তৈরি করা অত্যাবশ্যক। সমাজবিপ্লবের পূর্বশর্ত হচ্ছে চিন্তার বিপ্লব। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি একজন কর্মীর চিন্তা-চেতনাগত বিপ্লব সাধিত না হয় এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন না হয়, তার দ্বারা আদৌ সমাজবিপ্লব সম্ভব নয়। চিন্তার বিপ্লবের মাধ্যমে একজন কর্মী নিজ আদর্শের প্রতি অনঢ় ও অবিচল থাকবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংগ্রামে আত্ম-নিবেদিত হবে। ফলস্বরূপ আদর্শের আলোকে কর্মীর চারিত্রিক বিপ্লবও সংঘটিত হয়। এ পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি প্রস্তুত হলে ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সামষ্টিক শক্তি অর্জিত হবে। এক পর্যায়ে সংগঠন দক্ষ ও যোগ্য

কর্মীবাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত হবে এবং কার্যকরী লোকবল তৈরি হবে। এটা হবে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি। প্রস্তুতির এ প্রাথমিক পর্যায়ে গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হলে বা কর্মীর চিন্তাগত বিপ্লব ও চারিত্রিক বিপ্লব সাধিত না হলে সমাজবিপ্লবের প্রত্যাশা হবে নিতান্তই অবাস্তব।

শক্তি সঞ্চয়ের পরবর্তী পর্যায়ে আসে উপকরণ সংগ্রহের প্রসঙ্গ। আয়াতে যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া প্রস্তুত রাখার তাগিদ দ্বারা শত্রুর মোকাবেলায় সময়োপযোগী যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে 'কুওয়াত' দ্বারা নিক্ষেপণ শক্তি বুঝানো হয়েছে। বর্তমান সময় নিক্ষেপণ শক্তি বলতে রাসায়নিক ও পারমানবিক শক্তির অধিকারী হওয়া বুঝায়, যা রাষ্ট্রশক্তির আওতায় থাকা সম্ভব। আয়াতে উল্লেখিত 'কুওয়াত' দ্বারা রাষ্ট্রীয় শক্তির অধীনে সংগৃহিত সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রকে বুঝানো হলেও মূলত শক্তি সঞ্চয়ের পরিধি ব্যাপক। কিছু জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে সামর্থ অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তবে শক্তি সংগ্রহের পুরোপুরি হক আদায় করতে হলে রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী হতে হয়। রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত শক্তি সঞ্চয়ের পূর্ণাঙ্গ তাকাজা পূর্ণ হয় না। কেননা বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত বিশ্বব্যাপী কুফর-সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তবে নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত তাগুতের মোকাবেলা করার শক্তি সাংগঠনিকভাবে অর্জন করা সম্ভব।

প্রস্তুতির সর্বশেষ অবস্থাতে আসে চূড়ান্ত সংগ্রামের পদক্ষেপ। এ পর্যায়ে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক কোনো সংগঠিত শক্তি প্রতিষ্ঠিত তাগুত ও বাতিল উৎখাতে চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দিতে পারে। সংগঠিত শক্তি যদি কোনো তাগুতি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনস্থ জনগোষ্ঠী হয়, তাহলে তার সংগ্রাম হবে সেই তাগুতি রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা উৎখাতের সংগ্রাম। এ পর্যায়ে তাগুতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি তার প্রস্তুতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যদি সংগঠিত শক্তি হয় ইসলামী রাষ্ট্র; তাহলে বিশ্বের সকল কুফর ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির মোকাবেলায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতির ব্যবহারই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সংগ্রামের পথ।

আদর্শ ও দক্ষ জাতি গঠনে চাই
বিজ্ঞানভিত্তিক, কর্মমুখী সর্বজনীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা